Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 116–123
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

নবনীতা দেবসেনের গল্প ও উপন্যাসের কয়েকজন কন্যা

মণিদীপা দাশ
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ, সিসটার নিবেদিতা গভর্মেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ ফর গার্লস
ইমেল : manidipa1958@gmail.com

Keyword
পুরুষ ও নারীর অসাম্য, নারীস্বাধীনতা, কয়েকজন মেয়ের কাহিনি, আত্মদীপ-আত্মশরণ।

Abstract
পুরুষ এবং নারীর সামাজিক অবস্থানের মধ্যে সাম্য কখনোই ছিল না। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সমাজে নয়। নানা দেশের ইতিহাসে নানা অধ্যায়ে বারে বারেই দেখা গেছে নারীদের অত্যাচারিত হ'বার ইতিবৃত্ত। মধ্যযুগের ইওরোপে স্বামীরা যুদ্ধে যাবার আগে স্ত্রীদের কোমরে পরিয়ে দিতেন চেস্টিটি বেল্ট। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ঐ বেল্ট খুলতেন। স্ত্রী-র প্রতি অবিশ্বাসের চিহ্ন এ'টি, যদিও পুরুষের বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হ'ত না। এগুলি বাস্তব— কিন্তু সাহিত্যে অনেকসময়েই এই অসাম্যের প্রতিবাদ করা হ'ত। গ্রীক নাটক 'মেদেয়া'তে স্বামী জেসনের অন্যায় কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেছিলেন মেদেয়া। স্বামীকর্তৃক প্রবঞ্চিত হ'বার বেদনা তিনি নিশ্চুপে সহ্য করেননি বরং স্বামীর প্রিয় দুই পুত্রকে (যারা মেদেয়ারও পুত্র) হত্যা ক'রে নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ, বাস্তবে অত্যাচারিত হওয়া এবং সাহিত্যে প্রতিবাদী হওয়ার উত্তরাধিকার বহু পুরাতন।

এই প্রতিবাদের থিম অভিনব কিছু নয়। সাহিত্যিক অনেক সময়েই এই কাঠামোতে রক্তমাংস আরোপ ক'রে কাহিনি বয়ন করেন। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই থিম বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত বটে কিন্তু ঘটনার প্রতিক্রিয়া হয়তো সাহিত্যে ভিন্নভাবে চিত্রিত হয়। সাহিত্যে এরকমটা অনেকসময়ে দেখা যায়, যে, বিদ্যা এবং যোগ্যতায় নারী পুরুষের চেয়ে অগ্রসর অথচ পুরুষকর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত মান্য করার ফলে তার জীবন হ'য়ে যাচ্ছে এলোমেলো। কখনো দেখা যায়, যে, কোনো নারী সামাজিক অভিমতের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিসিদ্ধ মত পোষণ করছে এবং সে ক্রমশঃ ঘরে ও বাইরে কোণঠাসা হ'য়ে যাচ্ছে। এরা কেউই কিন্তু লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছে না, যেহেতু নঞর্থকতা সাহিত্যে প্রত্যাশিত নয়। অর্থাৎ মোদ্দা কথাটা এ-ই, যে, বাস্তবে হেরে যাওয়া নারীরা সাহিত্যে জিতে যাচ্ছেন। আবার এ সত্যটাও সামনে চলে আসছে যে, প্রথাবিরুদ্ধ পথে হাঁটতে গেলে দমনপীড়ন অবশ্য বরাদ্দ কী বাস্তবে, কি সাহিত্যে।

সমাজে যা কিছু ঘটতে থাকে, তা ক্রমশঃ সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসের পাতায় চলে যেতে থাকে। একইসঙ্গে তা বিক্রিয়া করতে থাকে সাহিত্যিকের মানসিক গবেষণাগারে, যেখান থেকে জন্ম নেয় প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ পুরুষের কলম থেকে আসতে পারে, তবে নারীরা লেখনী থেকে তা আরো ব্যাপ্ত এবং গভীর চেহারায় আসা সম্ভবপর। আর সাহিত্যিক নারী বা পুরুষ যাই-ই হোন, এই প্রতিবাদ করাটা তাঁর অবশ্যকর্তব্য। 'ন্যায়ের বিজয়'কে পরিস্ফুট করে তোলবার নৈতিক দায়িত্ব

সাহিত্যিকের আছে। সেই প্রতিবাদগুলিকেই বিশ্লেষণ ক'রে নবনীতা দেবসেনের লেখায় উপস্থিত কয়েকটি কন্যার বিষয়ে একটি ধারণা তৈরী করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

Discussion

পুরাকালে রচিত ঋগ্বেদের শ্লোকে নারীদের বিষয়ে সম্মাননা এবং অবমাননা— এই দু'প্রকার উদাহরণ-ই দেখা গেছে। সম্ভবতঃ সমাজেও নারীদের বিষয়ে এই দু'প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীই প্রচলিত ছিল তখন এবং এখনও তা আছে। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্তর— না সম্মান না অপমান। নারীকে শুধুমাত্র মানুষ হিসাবেই মর্যাদা দেওয়া- এইটা বেজায় কঠিন একটা কাজ। সমাজ যত সামনের দিকে এগোয় তার সঙ্গে ভারসাম্য রেখে বদলায় সমাজের বাইরের ও ভিতরের গড়ন। এই বদলের প্রভাব পুরুষের চেয়েও বেশি পড়ে নারীর ওপর। নারীস্বাধীনতার পথে অনেক বাধাবিপদ আছে। সমাজের দমনপীড়নের ঢেউ নারীদের জীবনে অধিক উত্তুঙ্গ হ'য়ে আসে। সেই ঢেউয়ের ধাক্কায় বাস্তবের নারী আহত হ'তে পারে, সাহিত্যের নারী কিন্তু পড়ে গেলেও উঠে দাঁড়ায় এবং ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। অন্ততঃ, কথাসাহিত্যে নবনীতা দেবসেন তেমনভাবেই নারীচরিত্র চিত্রণের চেষ্টা করেছেন। এই কাজটি করবার জন্য তিনি পুরাণের কিছু কাহিনির নবনির্মাণ করেছেন।

তাঁর গল্পে রয়েছে জনকদুহিতা সীতা-র কথা। প্রকৃতিকন্যা সীতা রামচন্দ্রের স্ত্রী কিন্তু স্ত্রী-র প্রাপ্য মর্যাদা তিনি পাননি। এর বিবিধ উদাহরণ আছে। সীতা যখন অশোকবনে বন্দিনী, তখন রাবণের সঙ্গে রামলক্ষ্মণের প্রবল যুদ্ধ হ'চ্ছিল। রাম লক্ষ্মণ উভয়েই বাণবিদ্ধ হ'য়ে মৃতপ্রায়। তবু রামচন্দ্র কোনোমতে উঠে বসলেন এবং লক্ষ্মণের এইপ্রকার দুর্দশা দেখে সীতাকেই তার জন্য দায়ী ক'রে বিলাপ করতে লাগলেন—

> "হায় জানকী, তোমার জন্যই আজ আমাদের পরিবারের এই দুরবস্থা। ...হায় লক্ষ্মণ ভাইটি, একবার চোখ মেলে চাও--- আমি সীতা-উদ্ধার ত্যাগ ক'রে তোমাকেই কোলে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবো। ...ছলাকলাময়ী সীতা চুলোয় যাক, ভাইটি আমার একবার চোখ মেলুক--- হে ঈশ্বর।"[১]

সীতা যদিও প্রথমে ভেবেছিলেন, যে এ নিশ্চয় রাক্ষসী-মায়া কিন্তু সত্যবাদিনী সরমার কথায় তাঁর ভুল ভাঙলো। অপমানিত সীতা অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত করলেন। কিন্তু ঝাঁপ দেবার পূর্বমুহূর্তে নারদ আবির্ভূত হ'লেন এবং তাঁর চতুর স্তোকবাক্যে সীতা নিবৃত্ত হ'লেন। রামচন্দ্র অচিরেই সীতা উদ্ধারে আসবেন, সীতা হবেন যমজপুত্রের জননী, অযোধ্যার রাজমহিষী এবং আদি মহাকাব্যের মহানায়িকা, এইসব কথা শুনে সীতা মোহগ্রস্ত হ'লেন। তিনি অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিলেন না এবং ভবিষ্যৎ তাঁর জন্য প্রস্তুত ক'রে রাখলো দীর্ঘতর আরো এক দহনজ্বালা। গল্পটির নাম 'অমরত্বের ফাঁদে'।

অপর একটি গল্প 'বসুমতীর কেরামতি'। গল্পের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে এইপ্রকার, যে, সীতাদেবীর পূতচরিত্র নিয়েও অযোধ্যাবাসীদের অনেকের মনে সংশয় জেগেছে, এ বিষয়ে নানাপ্রকার কানাকানি চলছে, রামচন্দ্রের সন্দেহবাতিক ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, সীতা মর্মাহত। তখন রামচন্দ্র আরেকবার অগ্নিপরীক্ষার দিন স্থির করলেন।

> "বারবার পৃথিবীর মানুষের সামনে সিংহের সার্কাস দেখানোর মতন সীতাকে দিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেওয়াতে রামের খুব ভালো লাগে। সীতা ঝাঁপ দেবেন, ম্যাজিকের মতন আগুন নিভে যাবে, অগ্নিদেব সশরীরে সীতাকে কোলে করে উঠে আসবেন— "এই মেয়ে দেবীতুল্যা, অপাপবিদ্ধা" বলে রামের হাতে তুলে দেবেন— এ দৃশ্য যারাই দেখবে তারা বিমোহিত হতে বাধ্য। অযোধ্যাতে কেউ এ ম্যাজিক-শোটা দেখেনি। ওটা হয়েছিল লঙ্কাপুরীতে।"[২]

পুনরায় অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাবে সীতা ধৈর্য হারালেন এবং পাতালপ্রবেশ করলেন। তবে, অনতিবিলম্বে মর্ত্যে রেখে আসা লবকুশের জন্য তাঁর মনকেমন করতে লাগলো। পাতালের নাগরাজ্যে তাঁকে ব্রতেশ্বরী দেবী ব'লে পুজো করা হ'তে লাগলো, তবু তাঁর মন মানলো না। অবশেষে বসুমতী দেবী মহাবলী বাসুকী নাগের সাহায্যে অযোধ্যানগরী থেকে লবকুশকে আনিয়ে

নিলেন পাতালে। সীতার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। তাছাড়া, সীতার অনুপস্থিতি এবং রামচন্দ্রের অমনোযোগের ফলে ছাড়া-গরুর মত ঘুরে বেড়ানো লবকুশ দুই ভাই ক্রমশঃ পাতালের নাগরাজ্যের সুশৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠল।

> "কঠিন অস্ত্রবিদ্যা তো তারা জানতই, আর জানত রামায়ণ গান করতে। এখানে শিখল সেবা শুশ্রূষা, সেলাই ফোঁড়াই, রান্নাবান্না, নৃত্যগীত, নাট্যাভিনয়, যোগাসন, কুংফু, ক্যারাটে। এমনিভাবে লবকুশ নাগলোকে থেকেই অযোধ্যার রাজসিংহাসনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।"[৩]

এ যেন প্রকারান্তরে লেখিকা পাঠককে জানিয়ে দিলেন যে, রাজার ছেলে হ'লেই রাজা হ'বার যোগ্য হয় না, তাকে শিখতে হয় আরও অনেক কিছু। তখনই পাঠকের মনে একটা সংশয় আবর্তিত হ'তে থাকে, যে, রামচন্দ্রও কি এত কিছু জেনেশুনে তবে সিংহাসনে বসেছিলেন? তা'হলে সীতাকে সন্দেহ করবার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি না থাকা সত্ত্বেও, তিনি ঐ কাজ করেছিলেন কি করে!

প্রথমে সীতা এবং তারপরে লবকুশের অদৃশ্য হ'য়ে যাবার ফলে, অযোধ্যার প্রজারা ক্ষেপে উঠল। খবর পাওয়া গেল, যে, এঁরা আছেন নাগরাজ্যে। হনুমান এবং লক্ষ্মণ— সীতার দুই প্রিয়পাত্র এঁদের ফিরিয়ে আনবার জন্য নাগরাজ্যে গেলেন এবং ব্যর্থ হ'লেন। বিশেষতঃ পাঠাগারে লব-কুশের নিবিষ্ট ভাবে পড়াশোনার দৃশ্য দেখে লক্ষ্মণের মন ভরে গেল। উপযুক্ত অভিভাবকত্বের অভাবে অযোধ্যানগরীতে এরাই দুর্বৃত্ত হ'য়ে উঠেছিল প্রায়। অতএব, লক্ষ্মণ লবকুশকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথাটা সীতাদেবীকে বলতেই পারলেন না। পরিবর্তে, তিনি ও হনুমান ফিরে গেলেন এবং ব্যর্থতার বার্তা জানালেন রামচন্দ্রকে। মরিয়া হ'য়ে, রামচন্দ্র এবার হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে নিজে গেলেন নাগরাজ্যে। যেখানে তাঁর যথোচিত খাতিরযত্ন হ'ল, কিন্তু সীতা রামের সামনে এলেন না। বসুমতী ও রামচন্দ্রের মধ্যে কিছু গোপন কথা হ'ল। সেই শুক্লা চতুর্দশীর তিথিতে, পুষ্পগন্ধ সুরভিত রাতে রামচন্দ্র টোকা দিলেন সীতার শয়নগৃহের দরজায়।

'আমি রাম'--- এই ঘোষণাতে দরজা খুলল না।

'একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে খুব জরুরি' – এই বক্তব্যেও দরজা খুলল না বরং শয়নগৃহের দীপটিও নিভে গেল।

এই হ'ল সীতার প্রত্যাখ্যান। লবকুশকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে দিতে রাজি হ'লেন তিনি একটি শর্তে, যে, লবকুশের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব থাকবে হনুমানের হাতে। রামচন্দ্রের হাতে নয়, কারণ রামের অযত্ন ও অবহেলায় ওরা নষ্ট হ'তে বসেছিল। এই তিরস্কারমূলক কথাও রামচন্দ্রকে শুনতে হ'ল! বাহ্যতঃ এই শর্ত দিয়েছিলেন বসুমতী, কিন্তু এর পিছনে সীতার সমর্থন ছিল।

শুধু মাত্র অবহেলা ও আঘাত সহ্য করা নয়, প্রত্যাঘাতের বৃত্তান্তও লিখেছেন নবনীতা। গল্পগুলি তারই প্রমাণ। এবং, শুধুমাত্র সামাজিক আচার আচরণ বা কর্তব্যপালনের ব্যর্থতাই নয়, শৌর্যে-ও যে রামচন্দ্র একমেবাদ্বিতীয়ম নন, তার প্রমাণ রেখেছেন লেখিকা একটি গল্পে। এটি অবশ্য রামায়ণের স্বীকৃত তথ্য যে লবকুশ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরেছিল, এবং অযোধ্যার সব বীরবৃন্দ সেই ঘোড়া ফেরৎ আনবার লড়াইতে হেরে গেছিলেন। সে তথ্য এখানে অবিকৃত আছে। তবে লেখিকারও কিছু সংযোজন আছে। রামচন্দ্র যখন ঐ দুই ভাইয়ের বীরত্বের প্রভূত প্রশংসা ক'রে, তাদের ভাগ্যবান পিতার নামটি শুনতে চাইলেন— তখন তারা রামচন্দ্রের নামোচ্চারণমাত্র করল না, (অর্থাৎ রামের এতটুকুও গর্বিত হ'ওয়ার সুযোগ নেই এখানে), পরিবর্তে হেসে বললে—

> "আমাদের পিতার নামে আপনার কাজ নেই, বরং নিজের ইষ্টদেবের নাম করুন, আপনাকে আজ আর কেউ রক্ষা করতে পারতো না। কেবল মাতৃবাক্য অনতিক্রম্য, তাই মায়ের আদেশে আমরা আপনার প্রাণ ফিরিয়ে এনেছি। এই নাকি ইক্ষাকু বংশের বীরত্ব? আমরা বীর নই। আপনারাই অক্ষম।"[৪]

খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে, রামচন্দ্র নন, সীতাদেবীই তাদের চালিকাশক্তি।

রামচন্দ্র স্ত্রী-পুত্রকে অযোধ্যায় নিয়ে যেতে চাইলেন। সীতা রাজি হ'লেন না। তিনি বাল্মীকিকে একটা বাক্য বললেন। তা হ'ল---

> "রাজ্যের নিন্দুকদের সভায় ডেকে এনে দিনের পর দিন আপন ধর্মপত্নীর নামে মিথ্যা নিন্দা যিনি সোৎসাহে শ্রবণ করেন এবং সেই মতে জনপ্রিয়তার লোভে নির্দোষের শাস্তি বিধান করেন, সেই স্বামীর ঘর করতে আপনি আমাকে বলবেন না।"[৫]

সীতার মনের দর্পণে বোধহয় রামচন্দ্র এবার সর্বপ্রথম নিজেকেও দেখতে পেলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে শোধরালেন না। বরং অযোধ্যায় ফিরে এসে, তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে দুই ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। তাঁর ভাইরা ঘুণাক্ষরেও এই বৈঠকের কথা জানতে পারলেন না। ঐ পরামর্শ অনুযায়ী, সীতাকে অনেক বুঝিয়ে, অযোধ্যার রাজসভায় আনা হ'ল এবং ইচ্ছা করেই রামচন্দ্র পুনরায় অগ্নিপরীক্ষার কথা বললেন। রাম জানতেন, যে সিংহাসনে সীতাকে বসানো হয়েছে, সেইটি রসাতলে নেমে যাবে যদি একটি বোতাম টেপা হয়। অপমানিতা সীতা যখন মা বসুন্ধরাকে ডাকছেন, তখনই রামচন্দ্র ঐ বোতামটি টিপে দিলেন। সিংহাসনসমেত সীতা রসাতলে নেমে গেলেন। রামচন্দ্র তাঁর উপদেষ্টাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন এবং তারপরেই বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন, যেন মা বসুমতী অবিলম্বে রামচন্দ্রের প্রিয়পত্নী সীতাদেবীকে ফিরিয়ে দেন ইত্যাদি বলে। সীতা ততক্ষণে সরযু নদীর তীব্র স্রোতে ভেসে গেছেন।

এই গল্পের যে text, তার মধ্যেই লেখিকা বুনে দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব ধারণাটি। তাঁর যা অন্বিষ্ট, অর্থাৎ সীতার প্রতি রামের আসল মনোভাবটি লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা— তা তিনি সাফল্যের সঙ্গে করেছেন। রামচন্দ্র পত্নীব্রত স্বামী ছিলেন কি না, সে বিষয়ে পাঠকের মনে আর কোনো ধন্দ থাকে না।

এ শুধুমাত্র রাম বা সীতার কথা নয়। একে বলা যেতে পারে মহিলাদের প্রতি পুরুষদের মনোভাবের কথা। সর্বক্ষেত্রে এমন হয় না এবং এমন সাধারণীকরণের মধ্যে হয়তো কিছু ত্রুটি-ও থাকতে পারে কারণ তুলনাক্রমে এই সব তথ্যের পাশাপাশি উল্লিখিত হয়েছে, যে, লঙ্কাপুরীতে মেয়েদের মর্যাদা অনেক বেশী, এবং রাবণ তাঁর স্ত্রী-দের অত্যন্ত সম্মান করেন। আবার 'স্ত্রী-দের' এই বহুবচনটি যখনই উচ্চারিত হয়, আধুনিক মনন তখনই ঐ 'সম্মান করা'-র বিপরীতে সাক্ষ্য দেয়।

নারীজগতের কথা যখন আসে, তখন তাদের কর্মজগৎ এবং মনোজগতের বৈচিত্র্যের কথাও এসে যায়। মনোজগতে সব মানুষই পৃথক এবং 'unique' আর কর্মজগৎ অনেক সময়েই মনোজগতের গড়নকে প্রভাবিত করে থাকে। মানুষ যা যা করে, তার পিছনে তার মনের যেমন একটা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ নির্দেশ থাকে, তেমনই মানুষের কাজের একটা প্রভাবও মনের ওপর পড়ে। এ যেন অনেকটা কাজ আগে, না কি মন আগে, এই আলোচনায় বৃত্তাকারে ঘুরে চলা। বরং দেখা যাক নবনীতা এ বিষয়ে কিভাবে তাঁর চরিত্রগুলিকে গড়েছেন।

প্রথম উদাহরণ অবশ্যই 'বামাবোধিনী' উপন্যাসের অংশুমালা। একটু লাজুক প্রকৃতির মেয়ে সে, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব খুবই কম। বইখাতা-ই তার কাছের জন। বাবা-মা বা ভাই-বোন নেই, আছে স্বামী মলয়, বান্ধবী মালিনী। অংশুমালা মানবীবিদ্যার অধ্যাপিকা- অধ্যাপনা এবং গবেষণায় নিরন্তর ব্যস্ত। রামায়ণ নিয়ে গবেষণার কাজে সে কিছুদিনের জন্য বিদেশে যায় এবং সেখানে প্রৌঢ়া মহিলা ওয়েন্ডি-র সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। জীবনের সব কর্তব্য সমাপন করে, ওয়েন্ডি এসেছেন লেখাপড়ার জগতে। ব্যাপারটি অংশুমালাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে, কারণ সে নিজেও ঐ একই বৈশিষ্ট্যের মানুষ। তাছাড়া, ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে খুব বেশীরকম কথা বলতে অনভ্যস্ত অংশুমালা মনে মনে ছাপার অক্ষরের সাথে কথা বলতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

দেশে ফিরে আসবার পর বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যায়। প্রথমতঃ নিকটবর্তী বস্তির বাসিন্দা কমলাম্মা বাধ্য হ'য়ে আশ্রয় নেয় অংশুমালার বাড়িতে। অন্ধ্রপ্রদেশের এই মেয়েটি নার্সিংহোমের আয়া। জীবনের অনেক কঠোর বৃত্তান্ত পার হ'য়ে তবে সে পায়ের তলায় একটু মাটি পেয়েছে, মুক্তি পেয়েছে স্বগ্রামে মা-দিদিমার জন্ম-ক্রীতদাসিত্বের জীবন থেকে।

দ্বিতীয়, রামায়ণ বিষয়ে অংশুমালার যে সব প্রবন্ধ 'South Eastern Review' -তে প্রকাশিত হয়, সেগুলির বিষয়ে অংশুমালার স্বামী এই মত প্রকাশ করে, যে, অংশু 'নোটোরায়েটি' দ্বারা 'ফেমাস' হবার 'চিপ' রাস্তাটি বেছে নিয়েছে। স্ত্রী-র বিষয়ে স্বামীর এই মন্তব্য থেকে যে বক্তব্যটি উঠে আসে, তা হ'ল অংশুমালার চিন্তাভাবনা বিষয়ে মলয়ের কোনো শ্রদ্ধার বোধ নেই। একথা সত্য, যে, ঐ সময়ে গোটা দেশ রামভক্তিতে আপ্লুত হ'য়ে আছে। অতএব কোন দেশের রামায়ণে রাম সীতার দাদা, কোন দেশের রামায়ণের সীতা রাবণের মেয়ে, আর কোন দেশের রামায়ণে বাল্মীকি মুনি সীতার প্রেমিক-কাম-

পালকপিতা— এসব কথা লেখা হ'লে রামভক্তরা ক্ষেপে যাবেন। কিন্তু, আসল কথাটা হ'ল একটা অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ তো প্রধানতঃ তথ্যের ভিত্তিতেই লেখা হয়, জনতার আবেগ তো সেখানে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষতঃ পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি তথ্য টীকা এবং রেফারেন্স সমেত উদ্ধৃত হয়েছে, এগুলি অংশুমালার মনগড়া কথা নয়। যা সত্য, তার দিক থেকে কি মুখ ঘুরিয়ে থাকা যায়? অংশুমালা এইভাবেই ভাবে। তাছাড়া, ঐখানে প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ইনসেস্ট থিম— যা শুধুমাত্র ইয়োরোপে নয়, ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্যেও দেখা যায়। অংশু-র এই বিশুদ্ধ অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্টে মলয় আগ্রহী হয় না, কেননা তার মনে হয় যে, গোটা দেশের মানুষের মনে রয়েছে রামোন্মাদনা। দূরদর্শনের রামায়ণে রাম-সীতা রাবণের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের নির্বাচনের সময়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই রকম একটা সময়ে অংশুমালা যে রামচন্দ্র এবং সীতার নামে কুৎসা করেছে, এর ফলে দেশবাসীর সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এই মলয় অংশু-র অপরিচিত। অংশুমালা হয়তো দেশবাসীর আবেগ বা দেশের অগ্নিগর্ভ অবস্থাটা সম্যক বুঝতে পারেনি কিন্তু আসলে সে মলয়কেও বুঝতে পারেনি। এতদিন তার ধারণা ছিল যে, মলয় বইপ্রেমী ভালো এবং গোছানো বইয়ের দোকানে ঢুকলে তাকে বার করা কঠিন। অংশুর ধারণা ছিল যে, মলয় তার গবেষণার কাজটিকে অসামান্য মনে করে। তার প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি বিষয়ে প্রশংসাসূচক চিঠিপত্রগুলি জেরক্স করে ফাইল করে রাখে। কিন্তু কার্যতঃ ব্যাপারটা এই যে, অংশুমালা যদি তার রিসার্চের বিষয়টিকে মনে করে 'অল নাম্বার অল ব্রেইন্স। অ্যান্ড নো হার্ট'[৬] তখন মলয়ের চোখে একটা অচেনা রূঢ় দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

অথচ, সময় প্রমাণ করে দেয়, যে, মলয়ই সঠিক। তাই বাল্মীকি রামায়ণের অফিসিয়াল ভার্শানের বাইরে আরো যে সব অলটারনেটিভ ভার্শান এবং থিম্যাটিক ভ্যারিয়েশন আছে, যে সব বিষয়ে লেখা প্রবন্ধের ফলশ্রুতিতে রাশি রাশি বিরূপ সমালোচনা অংশুমালার কাছে এসে যায়। মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও প্রবন্ধের তৃতীয় অংশটি এডিটর প্রকাশ করেন না। মলয়ের কনট্রাকচুয়াল চাকরির বস দেশপান্ডে মলয়কে কঠিন কিছু কথা শুনিয়ে দেন, মলয় অংশুকে বলে---

> "যখন গুন্ডারা তোমাকে মারতে আসবে তখন তাদের ওই কথাটা বুঝিয়ে দিয়ো ভাল করে। ডোন্ট এক্সপেক্ট মি টু বি দেয়ার। ইউ আর জিওপারডাইজিং মাই ফিউচার অ্যাজ ওয়েল। এতদূর দায়িত্বহীনতা!"[৭]

অথচ অংশুমালা হঠকারী নয়। সে যা যা করে তার পিছনে তার মনের সমর্থন থাকে। সে কি কি করে?

এক — সে তার গবেষণার মূল ক্ষেত্র থেকে পাশের দিকে সরে যায়— আসলে রামায়ণের গঠনভঙ্গির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে সে সরে যায় রামায়ণের প্রাণ-মনের কাছে— মেয়েদের রামকথার অফশুটটা নিয়ে কাজ ক'রে সে আসলে রামায়ণের বিস্তৃতিটাকে ধরতে চায়।

দুই — সে মলয়ের কথা না শুনে কমলাম্মাকে আশ্রয় দেয়।

কোনো কাজটাই আপাতভাবে সুফলপ্রদ হয় না। প্রথম কাজটা প্রচুর পাঠককে রাগিয়ে দেয়। দ্বিতীয় কাজটা মলয়ের কাছে কমলাম্মাকে এগিয়ে দেয়। নিজেকেই অবিশ্বাস ছিল মলয়ের, সে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে রাখতে পারে না।

পরবর্তীকালে, 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসে দেখা যায় অংশুমালার সঙ্গে মলয়ের বিচ্ছেদ হ'য়ে গেছে এবং অংশুমালা তাঁর কাজগুলির জন্য প্রশংসিত হয়েছেন, মানবীবিদ্যাচর্চার বিখ্যাত অধ্যাপিকা তিনি। অর্থাৎ যা আপাত ফলাফল, তারপরেও অনেক কিছু ঘটে। তাই নিজের বিশ্বাসটিকেই স্থিরভাবে আঁকড়ে থাকতে হয়। আর তাই প্রাক্তন প্রেমিক রবি যে আসলে সমকামী, একথা জানবার পর অংশুমালার পৃথিবী তাৎক্ষণিকভাবে চুরমার হ'য়ে গেলেও, ক্রমশঃ ঐ প্রেমজীবনের স্মৃতি হ'য়ে ওঠে যেন বিগত বসন্তের শুকনো পাতার রাশি। তা উড়ে গেলেও ক্ষতি নেই। অন্ধকারকে নয়— তিনি বরাবর বিশ্বাস করেছেন আলোতে, তিনি কখনো তাঁর দৃষ্টিকে শিকল পরিয়ে রাখতে চাননি, তিনি শুধুমাত্র লক্ষ্যভেদের পাখির চোখটুকুমাত্র দেখেন না, তিনি দেখেন নীল আকাশ আর গাছের পাতায় রোদ-বাতাস। সময় এলে লক্ষ্যভেদ তিনি-ও করবেন, কিন্তু পান্ডিত্যের অভিমানের 'রণং দেহি' মূর্তি নিয়ে বুদ্ধির যুদ্ধক্ষেত্রে নামবেন না। চলে-যাওয়া-সময়ের সঙ্গেও তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। জীবনে রবি এবং মলয়ের উপস্থিতিতে অংশুমালা নিজেকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারেন।

অবশ্য, নিজেকে বোঝা-র কোনো শেষ নেই। তাই 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসে একটু অন্যপ্রকার অংশুমালাকে দেখা যায়। মালিনী এবং সঞ্জয়ের কন্যা পুষ্পাকে তিনি খুব স্নেহ করেন; মালিনীর দ্বিতীয় বিবাহ এবং দ্বিতীয় কন্যাজন্মের পর পুষ্পা

প্রধানতঃ অংশুমালার কাছেই থাকে। এই পুষ্পা এক বিবাহিতা মেয়ে-র প্রেমে পড়ে। সেই মেয়েটি অর্থাৎ সালমা দূরদর্শনের একটি জনপ্রিয় শো-এর অ্যাংকর, চেহারায় এবং সাজসজ্জায় যথেষ্ট স্টাইলিশ। সালমাকে ভালোবেসেই পুষ্পা নিজের ট্রু সেলফকে খুঁজে পায়। অংশুমালা খবরটি শুনে স্তব্ধ হ'য়ে যান। সমপ্রেমের কারণে মালিনী এবং অংশু একসময়ে প্রবল কষ্ট পেয়েছেন। পুষ্পার জন্য সেই কষ্টের পুনরাবৃত্তি তিনি চান না। অথচ গে প্রাইডের পক্ষে তিনি লেখালেখি করেন, লেখেন---

> "গে-লেসবিয়ানদের সমস্যা তাদের যৌনতা নয়, তাদের সমস্যা আমরা যেহেতু হেটেরোসেক্সুয়াল সম্পর্ককেই আমরা একমাত্র পবিত্র প্রাকৃতিক সম্পর্ক বলে ধরে নিই। সমপ্রেমীদের উদ্ভট কোনও গ্রহান্তরের প্রাণী না ভেবে সমাজ তাদের স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে শিখছে।"[৮]

পুষ্পাকে নিয়ে গে প্রাইডের শোভাযাত্রাতেও গেছিলেন তিনি। কিন্তু যে মুহূর্তে পুষ্পা নিজের সেক্সুয়াল প্রেফারেন্স ঘোষণা করল, তখনই স্থাণু হ'য়ে গেলেন তিনি। তত্ত্বকথা লেখা এককথা, তত্ত্ব নিয়ে ঘর-করা আরেক কথা। স্পষ্টভাষায় বললে, এটি দ্বিচারিতা— যা তাঁর প্রাক্তন স্বামী মলয়ের মধ্যেও দেখা গেছিল। সে মুখে বলত, তার হোমোফোবিয়া নেই, অথচ সমকামীদের কাছে এলে যুক্তিবহির্ভূত কারণে তার 'গা রী রী' করত। এই আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্যের ব্যাপারটা সেইসময়ে অংশুমালা সহজভাবে নেয়নি। অথচ, পরিণত বয়সে অংশুমালা চৌধুরী-ও একই কাজ করলেন। এটিকে পরাজয়ের বৃত্তান্ত বলা যেতে পারত যদি না ওয়েন্ডি খুব সহজভাবে অংশুর চিত্তসঙ্কট দূর করবার জন্য বলতেন—

> "লেসবিয়ানস আর হিউম্যান, দে আর উইমেন, জাস্ট লাইক ইউ অ্যান্ড মি, সমস্যাটা কী তবে? আমাদের তো খুশি হওয়া উচিত, অংশুমালা, যে পুষ্পা জানে ও কী চায়।"[৯]

অংশুমালা প্রথমে বুঝতেই পারেন না যে, এই খবরে তিনি কেমন করে খুশি হবেন! বরং তাঁর মনে হয় যে, একটা কাঁটা-ভরা পথে তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন বোকা মেয়েটাকে। অর্থাৎ মনে মনে তিনি তাহলে সমপ্রেমকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ অস্বাভাবিক আচরণ বলেই মনে করেন! অবশ্য, পরে তিনি স্বাভাবিক চেতনায় ফিরে আসেন, এবং নিজের মানসিক সঙ্কীর্ণতা থেকে নিজেই বেরিয়ে আসেন। আর তাই বিষ্ণুপুর ভ্রমণে পুষ্পার সঙ্গে সালমাকেও নিয়ে যেতে রাজি হ'য়ে যান তিনি। লেখিকা এখানে একটি একদা শক্তপোক্ত কিন্তু অধুনা ভাঙাবাড়ির প্রতীক ব্যবহার করেছেন। আমাদের প্রথাগত ধ্যান ধারণা ঐ শক্ত বাড়িটার মত, যা সহজে ভাঙতে চায়নি। যা ভিতর থেকে বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু উপর্যুপরি হাতুড়ির ঘা খেয়ে তা একসময়ে স্তূপীকৃত রাবিশে পরিণত হ'য়ে গেল। নতুনকে স্থান দিতে গেলে পুরোনোকে সরে যেতে হবে। এখানে প্রাকৃতিক নিয়মও জয়ী, নবচেতনালব্ধ মানুষও জয়ী।

মানুষের কাজের প্রভাব তার মনের ওপর পড়ে কিনা, এ বিষয়ে 'মায়া রয়ে গেল' উপন্যাসের সুষমা-র কথা আলোচনাযোগ্য। সতেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁর, অত্যন্ত ভীরু ও কোমল ছিলেন, সব অত্যাচার মেনে নিতেন। কনভেন্ট থেকে পাশ করেই তাঁর বিয়ে হয়, তারপর কলেজে ভর্তি হন। তিনদিনের বাসভাড়া হিসেবে একটাকা দিতেন শাশুড়ি, ফলে শরীর খারাপ লাগলেও রিক্সা নেওয়া যেত না। খিদে পেলেও খাবার কেনা যেত না। সকালবেলায় কাজের লোকেদের সঙ্গে বাসি রুটি আর গুড় পেতেন জলখাবার হিসেবে যা তিনি খেতে পারতেন না। ডাক্তার স্বামী প্রসেনজিৎ তখন মেডিক্যাল কলেজে চাকুরিরত এবং পুরো বেতন তুলে দিতেন মায়ের হাতে। স্বামী-স্ত্রী সিনেমায় যেতে গেলে মায়ের কাছে টাকা এবং বাবার কাছে অনুমতি চাইতে হ'ত। প্রথম সন্তান শুভম জন্মাবার পর মায়ের সঙ্গে ছেলের মন কষাকষি হ'ল, অতএব তিনজন রইলেন ভাড়াবাড়িতে। শ্বশুরমশায়ের মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়িতে ফিরলেন সুষমা, কিন্তু শাশুড়ির শত্রুতা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। তিনি ছেলের কাছে পুত্রবধূর নামে মিথ্যা কথা বলতে শুরু করলেন। অসুস্থ অবস্থায় আয়াদের বসিয়ে রেখে পুত্রবধূকে দিয়ে নিজের নোংরা কাপড় পরিষ্কার করাতেন তিনি। প্রসেনজিৎ এই অত্যাচারের কোনো প্রতিকার করেননি। তাই বুদ্ধি দিয়ে মোকাবিলা শুরু করেছিলেন সুষমা। শ্বশুরবাড়ির বিচিত্র অযৌক্তিক আবহাওয়া থেকে পুত্রকে বাঁচিয়ে চলেছেন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হইচই করে স্বাভাবিকভাবে বড়ো হয়েছে সে, এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার আগেই যে ছেলে সহপাঠিনীকে বিয়ে করে ফেলেছে। অতঃপর দুজনেরই ফেলোশিপ প্রাপ্তি এবং বিদেশ গমন। ভট্টাচার্যবাড়ির

সাবেকি নিয়মকানুন থেকে সুষমা বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন শাশুড়ির মৃত্যুর পর। প্রসেনজিৎ স্ত্রী-কে 'হিন্দু-জাগরণী' সংঘে ভর্তি করে দিলেন। 'হিন্দু নারী সুরক্ষা সমিতি'র সঙ্গেও তাঁকে যুক্ত করা হয়। পরে তাঁর কাজকর্ম থেকে হিন্দু শব্দটা বাদ দেন সুষমা, গড়ে তোলেন 'বালিকা সুরক্ষাশ্রম' এবং 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সংঘ'। সমাজসেবামূলক কাজে অবদানের জন্য 'উত্তম্যান অফ দ্য ইয়ার' সম্মান লাভ করেন তিনি। আর কর্মজীবন থেকে রিটায়ার ক'রে ঘরে বসে যান ডক্টর প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য। বিস্তৃত কর্মজগতে বিচরণরত সুষমা আর তাঁর নাগালের মধ্যে নেই। এমন কি স্বামীসেবা ব্যাপারটাকেও তিনি আর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। সতেরো বছর বয়স থেকে অনেক প্রতিকূলতা সহ্য ক'রে ছেচল্লিশ বছরে পৌঁছেছিলেন তিনি, আর তার পরের দশ বছরে বিকশিত হয়েছিল তাঁর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি। তাঁর ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হ'য়ে গেছে। আসলে প্রতিটি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে।

'পাড়ি' উপন্যাসে শমিতা নামে একটি চরিত্র আছে। সন্তানজন্মের জন্য তখনও প্রস্তুত ছিলেন না তার মা। ফলে শমিতা মায়ের পরিবর্তে তার বাবার কাছের মানুষ হ'য়ে উঠেছিল। কানপুর আই.আই.টি থেকে ইলেকট্রনিক এঞ্জিনীয়ারিং-য়ের ডিগ্রী পেল শমিতা এবং প্রথম প্রেমিক কপিলের থেকে পেল বিশ্বাসঘাতকতা। সংসারে অনাহুত শমিতা চেয়েছিল যে, কেউ তার অস্তিত্বটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করুক। কপিল-কান্ডের পর সে নিজেই জর্জিয়া নিবাসী বাংলাদেশী পাত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল নিজের জীবনকে একটা নতুন সংজ্ঞা দেবার জন্য। কিন্তু এই বিবাহ ক্রমশঃ পরিণত হ'ল দখলদারিতে। অনিরুদ্ধ তার ইচ্ছামত শমিতার ওপর অত্যাচার করত, ইচ্ছামত তাকে ভালোবাসত। নতুন জীবনের স্বপ্ন প্রায় মুছে যাচ্ছিল শমিতার কিন্তু তখনই সে টের পায়, সে অন্তঃসত্ত্বা। নিজের অজাত সন্তানকে একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দিতে চেয়ে, সে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। নিকটস্থ দোকানের মালিক মিসেস জিলানী এবং দোকানের কর্মচারী বেটি দেশাইয়ের সহায়তায় শমিতা অনিরুদ্ধ-র তালাবন্ধ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। অতঃপর তার দায়িত্ব নেয় প্রথমে 'রক্ষা' এবং পরে 'সহেলী' নামের এশিয়ান মহিলা সহায়ক সংস্থা। এদের সহায়তায় সে পৌঁছোয় বস্টনে, তার নিজের বোন রোমির কাছে, সেখান থেকে চলে যায় কলকাতায়, তার আই.আই.টি-র রুমমেট রুচির কাছে। দিল্লীতে মায়ের কাছে যায় না সে, কারণ অনিরুদ্ধ তাকে দিল্লীতেই খুঁজবে। চূড়ান্ত বিপর্যস্ত অবস্থাতেও এই হিসেব তাকে করতে হয়। নিজের ডিগ্রীর জোরে শমিতা চাকরি পায় মোটোরোলাতে। শমিতার মেয়ে মিতুল অবশ্য দিল্লীতে তার দিদিমা ও বড়দিদিমার তত্ত্বাবধানেই জন্মায়। মিতুলের জীবন থেকে অনিরুদ্ধর নামটি সুকৌশলে মুছে দেওয়া হয়। শমিতা ডিভোর্স পেয়ে, নতুন জীবন লাভ করে, যদিও একসময় তার মনে হয়েছিল এই বিয়েটাই তাকে নতুন জীবন দেবে। মানুষের জীবনে আসলে এত চমক লুকিয়ে থাকে, যে, তেমন পরিস্থিতি এলে মানুষ পূর্বভাবনার বিপরীত মেরুতে চলে যায়।

চাকরি, মাতৃত্ব এবং স্বাধীনতার বোধ– এসব মিলিয়ে যখন শমিতা একটা নতুন পৃথিবী পায়, তখন তার জীবনে আসে অর্চিস্মান। সে এক ফ্রি স্পিরিট, তুলনারহিত এক মানুষ, যদিও শমিতার জীবনে তার আবির্ভাব একটু আরোপিত পরিণতি বলেই মনে হয়। হয়তো শমিতার ভঙ্গুর পায়ে আর একটু বল যোগান দেবার জন্যই তার আবির্ভাব। তবে যখন তখন অনিরুদ্ধর লাথির চোটে মুখ-থুবড়ে পড়া শমিতা থেকে নিজের-পায়ে-দাঁড়ানো শমিতা পর্যন্ত পৌঁছোতে যে পথ পাড়ি দিতে হয় মেয়েটিকে, সেখানে অর্চিস্মানের তেমন কোনো ভূমিকা নেই, বরং ভূমিকা আছে বিদেশের সাহায্যকারীদের, এবং এতাবৎকাল অব্যবহৃত নিজের এঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রীটির।

'আত্মদীপো ভব, আত্মশরণ্যে ভব, অনন্যে শরণ্যে ভব' — বুদ্ধদেবের এই চিরকালীন উপদেশ মানুষকে বলে দেয়, যে, নিজেকে প্রদীপ ক'রে তোলো, নিজেরই শরণ নাও, অন্যকারোর শরণ নিও না। নিজেরই আলোতে অন্ধকার পথকে আলোকিত ক'রে মানুষকে চলতে হয়। স্বাধিকারপ্রমত্ত দাম্পত্যের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞানকে সর্বদা লম্বাহাতা ব্লাউজ পরে ঢাকা যায় না। বরং অবসান ঘটাতে হয় ঐ পরিস্থিতির, আর আমাদের বেঁচে থাকাকে সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ ক'রে তোলবার চেষ্টা করতে হয়। বাস্তবে সর্বদা এমন হয় না কিন্তু যা হওয়া উচিৎ ছিল, তার কথাই নবনীতা দেবসেন তার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে বলে যান।

তথ্যসূত্র :

১. দেবসেন, নবনীতা, 'অমরত্বের ফাঁদে', গল্পসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ২৩২-২৩৩
২. দেবসেন, নবনীতা, 'বসুমতীর কেরামতি', গল্পসমগ্র-৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৫, পৃ. ৭৮
৩. তদেব, পৃ. ৮২
৪. দেবসেন, নবনীতা, 'সীতার পাতাল প্রবেশ', গল্পসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ২৪১
৫. তদেব, পৃ. ২৪৪
৬. দেবসেন, নবনীতা, 'বামাবোধিনী', দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৪, পৃ. ২৭০
৭. তদেব, পৃ. ২৬৭
৮. দেবসেন, নবনীতা, 'অভিজ্ঞান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১২, পৃ. ৪৯
৯. তদেব, পৃ. ৫২